পাহাড়ে বৈসাবি উৎসব

মাহবুব আলম

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য অঞ্চলেও শুরু হয়েছে বর্ষবরণের প্রস্তুতি। পড়ে গেছে কেনাকাটার ধুম। সেই সাথে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে সাজানো হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি জুমঘর মোনঘর। এক কথায় পাহাড়ের প্রতিটি গ্রামের ঘরে ঘরে চলছে উৎসবের আমেজ। করোনা মহামারীর ফলে গত কয়েক বছর এই উৎসবে যে ভাটার টান ছিল এবার সেই ভাটার টান শেষে যেন জোয়ার এসেছে। সবাই ব্যস্ত সময় পার করছে। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ দেখা গেছে। তাইতো ঘরে ঘরে সাজ সাজ রব। সন্ধ্যার পর দোকানগুলোতে উপচে পড়া ভিড়। কেউ কিনছে কাপড়, কেউ ঘর সাজানোর জিনিসপত্র ও উপহার সামগ্রী। পাহাড়ের এই বর্ষবরণ অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে হয়। পাহাড়ে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বৈসু, বিজু, সাংগ্রাই সহ বিভিন্ন নামে বর্ষবরণ করে। এই বর্ষবরণ বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। ইতিহাসবিদদের মতে, মুঘল আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদিবাসীরা মুঘল সুবেদারদের খুশি করতে বেশ জাঁকজমকের সাথে এই উৎসব পালন করত।

দেশের পার্বত্য অঞ্চলের তিন জেলা; রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গা, ঘুমি, রাখাইনসহ ১৩টি আদিবাসী গোষ্ঠী বসবাস করে। এই ১৩টি আদিবাসীদের মধ্যে ১১টি আদিবাসী ভিন্ন ভিন্ন নামে নববর্ষ পালন করে, ভিন্ন ভিন্ন রীতি ও পদ্ধতিতে। তবে একটি বিষয়ে সুস্পষ্টই মিল রয়েছে তা হলো- তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর এই উৎসব ন্যূনতম তিন দিনের। এবং এই উৎসব সবার বৃহত্তম সামাজিক উৎসব ও মিলনমেলা। সেই সাথে এই উৎসবে ধর্মীয় সংশ্লেষ রয়েছে। যা ওদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরম্পরা। এই পরম্পরা অনুযায়ী আদিবাসীরা শুধু বর্ষবরণই নয় একই সাথে বর্ষবিদায়ও জানায় আনন্দঘন পরিবেশে।

১৩টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃহত্তর হচ্ছে ত্রিপুরা, মারমা, চাকমা, রাখাইন ও তঞ্চঙ্গা। বৃহত্তম ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের নববর্ষ উৎসবের নাম বৈসু বা বাইসু। মারমাদের কাছে সাংগ্রাই। চাকমাদের কাছে বিজু বা বিঝু। তঞ্চঙ্গাদের বিসু। এই চার উৎসবের প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে নতুন নামকরণ হচ্ছে বৈসাবি। বৈ শব্দটি এসেছে ত্রিপুরাদের বৈস্য থেকে সা শব্দটি মারমাদের সাংগ্রাই থেকে এবং বি শব্দটি চাকমাদের বিজু ও তঞ্চঙ্গাদের বিসু থেকে। অর্থাৎ এই চার শব্দের সম্মিলিত রূপ হলো বৈসাবি। যা এখন পাহাড়ে বহুল প্রচলিত। তবে একথা সত্য যে, পাহাড়ে প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ নামেই বর্ষবরণ করে। এই বর্ষবরণ এখন সমতলের বাঙালিসহ সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাইতো অনেকেই ছুটে যায় পাহাড়ি আদিবাসীদের বর্ষবরণ বৈসাবি দেখতে।

বৈসু

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উৎসব বৈসু। চৈত্র মাসের শেষের দুই ও বৈশাখের প্রথম, এই তিন দিনব্যাপী উৎসব হয়। উৎসবের প্রথম দিনকে বলা হয় হারি বৈসু। দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় বৈসুমা। আর শেষ দিনটিকে বলা হয় বিসি কাতাল। এই দিন শেষ হয় ঈশ্বরের কাছে সুখ-সমৃদ্ধি আর বয়স্কদের কাছে আশীর্বাদ কামনা করে। হারি বৈসুর ভোরে তরুণ-তরুণীদের ফুল সংগ্রহের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এরপর ওই ফুল দিয়ে ঘরবাড়ি সাজানো হয়। ফুল দেওয়া হয় মন্দিরে এবং নদীর তীরে। সেই সাথে প্রিয়জনকে ফুল উপহার দেওয়া-নেওয়া চলে কমবেশি সারাদিন। ঐদিন দেবতার নামে নদী-খালে ফুল ছিটানো হয়। একে বলা হয় পুষ্প পূজা বা ঘুম কামিং পূজা। এদিন সকালে তরুণ-তরুণীসহ শিশু-কিশোররা বিশেষ একটি গাছের পাতার রস ও হলুদ দিয়ে গোসল করে। তারপর শুরু করে পরস্পর ফুল বিনিময়। আর নারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিন্নি চালের পিঠা ও হাতে তৈরি মদ উৎপাদনে। যাকে বলা হয় দো চুয়ানি। অবশ্য এজন্য বেশ কদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

হারি বৈসুতে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের গবাদি পশুকেও গোসল করায়। হাঁস-মুরগিকে ঘটা করে শস্য দানা দেয়। সন্ধ্যায় শুরু করে গরয় নৃত্য। মন্দিরে প্রদীপ জ্বালানো। এই নৃত্য চলে টানা সাত দিন। কখনো কখনো দীর্ঘ ২৮ দিন। সেই সাথে দিনভর সুস্বাদু খানাপিনা তো আছেই। আছে অতিথি আপ্যায়ন। অতিথি আপ্যায়নের অন্যতম বিষয় দো চুয়ানি।

বৈসুর দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় বৈসুমা। এদিনটিতে মূলত খাদ্য উৎসব হয়। এর মূল আকর্ষণ ৩০-৪০ ধরনের সবজি দিয়ে 'লাবড়া' তৈরি। এছাড়াও এদিনের খাবার তালিকায় সেমাই, পায়েস ও নুডলস সহ নানান উপাদেয় খাদ্য থাকে।

উৎসবের তৃতীয় দিনে বর্ষবরণ করা হয়। একে বলা হয় বিসি কাতাল। পরিবারের ছোটরা এই দিন বড়দের পা ধুয়ে দিয়ে প্রণাম করে এবং নতুন বছরের জন্য মঙ্গল কামনা করে।

বৈসু উৎসবে ত্রিপুরা নর-নারী শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন কাপড় পরে এবং আত্মীয় বন্ধু ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। সেই সাথে লাঠিখেলাসহ নানান ধরনের খেলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এছাড়াও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পানি ছিটানো হয়। তাকে বলা হয় পবিত্র পানি। আসলে পানিকে ওরা পবিত্রতায় প্রতীক মনে করে। অবশ্য শুধু ত্রিপুরা নয়, অন্যান্য আদিবাসীরাও পানিকে পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করে। তাইতো মারমারা ঘটা করে পানি ছিটানোর উৎসব করে।

সাংগ্রাই

মারমা'রা বর্ষবরণ করে সাংগ্রাই নামে। এই উৎসব চলে চার দিন। উৎসব শুরু হয় চৈত্র মাসের ৩০ তারিখে ভোরে তরুণীদের শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। তরুণীরা এই শোভাযাত্রায় নেচে গেয়ে আনন্দ করে। সেই সাথে শোভাযাত্রায় বুদ্ধের ছবি ও মূর্তি বহন করে। ওই ছবি ও মূর্তিকে তারা নদীর তীরে নিয়ে দুধ অথবা চন্দন কাঠের পানি দিয়ে পবিত্র করে আবার তা ফিরিয়ে নিয়ে আসে। মারমা'রা আদিকাল থেকে এভাবেই বর্ষবিদায় করে আসছে। ভোরের এই শোভাযাত্রা শেষে যাত্রায় অংশগ্রহণকারী তরুণীরা জলনৃত্য করে। এই সময় তরুণী ও শিশুদের সঙ্গে তরুণরাও অংশগ্রহণ করে।

তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে একদিকে যেমন উৎসবের মেজাজ থাকে অন্যদিকে ধর্মীয় সংশ্লেষও থাকে ভালোভাবে। তাই এই তিন দিনের প্রতিদিনই বুদ্ধ মন্দিরে দান, পুষ্প অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেই সাথে বর্ষবরণের দিন সন্ধ্যায় ফানুস ওড়ানো হয়। রাঙ্গামাটিতে এই ফানুস ওড়ানো উৎসব রীতিমতো আবেগ আর আনন্দঘন। স্বচক্ষে না দেখলে এটা বিশ্বাস করা বেশ কঠিন। এই উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বরে রীতিমতো মেলা বসে যায়। মেলায় বিক্রেতারা নানান পসরা সাজিয়ে বসে। এই মেলা চলে মধ্যরাত পর্যন্ত। তারপর আরো কয়েকদিন পর্যন্ত। তবে উৎসবের মূল আকর্ষণ হলো পহেলা বৈশাখের পানি উৎসব। এই উপলক্ষ্যে এখন রীতিমত প্যান্ডেল করে বিশাল আয়োজন করা হয়। এমন একটি উৎসব প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে কর্ণফুলী নদীর তীরে। দেখেছি বিশাল প্যান্ডেলের মাঝে পানি উৎসব। এই উৎসবে পরস্পরের প্রতি তরুণ-তরুণীরা পানি ছিটায়। জনপ্রিয় এই উৎসবে দেখেছি তরুণীদের উচ্ছ্বাস আর আবেগ। এই উৎসবে মারমা যুবক-যুবতীরা তাদের পছন্দের মানুষটির গায়ে পানি ছিটিয়ে তাদের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায়। ভালোবাসার এমন বর্ণাঢ্য উচ্ছ্বাস এমন বর্ণাঢ্য অনুভূতি আর কোন 'গন্ধার্ব্য' শুধু সাংগ্রাইতে সম্ভব। তবে এই পানি উৎসবের মূল বিষয় জলপূজা। এই পূজার মধ্য দিয়ে গত বছরের সকল পাপ ধুয়ে মুছে যায়। আর তাইতো পরস্পরের প্রতি পানি ছিটানো হয়।

আমি দেখেছি বিশাল প্যান্ডেলে একটি বড় নৌকায় পানি ভর্তি। সেই নৌকায় একপাশে সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে আছে একদল তরুণ-তরুণী। তারা মগ দিয়ে নৌকা থেকে পানি তুলে সামনের সমাবেতদের প্রতি ছুঁড়ে মারছে। তাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। একদলের পানি ছিটানো শেষ হলে আর একদল এসে দাঁড়াচ্ছে, এই একই কাজ করতে। এছাড়াও বিশাল বিশাল ডেকচিতেও পানি রাখা হয়। এই পানি মগ বা হাত দিয়ে ছিটানো হয়। দেখেছি, কাউকে পুরো ভিজিয়ে দিলেও কেউ কিছু বলছে না বরং যেন খুশি।

দেখেছি, বাদ্যের তালে তালে মিছিল করে ওই উৎসবে হাজির হতে। দেখেছি বাদ্যের তালে তালে পানি ছিটানো। এই পানি ছিটানো উৎসবকে মারমা ভাষায় বলা হয় বিলিং পোয়ে। এ বিষয়ে এক মারমা কবি চিংলা মাং বলেছেন, মারমা জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস পানি উৎসবের মধ্য দিয়ে অতীতের সব দুঃখ, গ্লানি ও পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। আর তাইতো এই উৎসবে ব্যাপক জনসমাগম হয়। দেখেছি কর্ণফুলীর খেয়াঘাটে অসংখ্য নৌকায় নদী পারাপার। আর নদীর ঘাট রীতিমতো মেলায় রূপ ধারণ। আর উৎসব মানেই খাওয়া দাওয়া তাতো আছেই। মারমারাও অন্যান্য আদিবাসীদের মতো সাংগ্রাইতে মনের সুখে নিজেদের ঘরে তৈরি মদ পান করে।

এই সাংগ্রাই উৎসবের একটা দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো অন্যান্য আদিবাসীদের মতে মারমা'রাও এই উৎসবে বয়স্কদের পা ধুয়ে দিয়ে তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

বিজু

পুরান বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানানো চাকমাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের নাম বিজু। বিজু উৎসব। কবে কখন কোথা থেকে এই উৎসবে সূচনা হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও মুঘল আমলে এই উৎসব যে বেশ ঘটা করে হতো তার সুনির্দিষ্টই তথ্য আছে। মুঘল আমলে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে খাজনা মাসুল ও শুল্ক পরিশোদ করতে হতো। মুঘলদের অধীনস্থ হিসেবে তখনকার আদিবাসী অন্যান্য শাসকদের মতো চাকমা রাজারাও এই নিয়ম মেনে কর ও খাজনা আদায় করত। এই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বাঙালির দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয় যে, আসাম ইনস্টিটিউটের পরিচালক জেপি মিলস ১৮ শতাব্দীতে চাকমাদের 'মোস্ট বেঙ্গলাইজড্ ট্রাইব' বলে উল্লেখ করেন। তবে তারা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখেই বিজু নামে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উৎসব করে আসছে। তিন দিনব্যাপী এই উৎসবের প্রতিদিনের ওরা ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছে। এই নাম অনুযায়ী প্রথম দিনের উৎসবকে বলা হয় ফুল বিজু। চৈত্র মাসের শেষের আগের দিন এই ফুল বিজু দিয়ে বিজু উৎসবের সূচনা হয়। এদিন ভোরে ফুল তুলে তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে শিশু-কিশোররাও গঙ্গা দেবীর উদ্দেশ্যে স্থানীয় নদী-খাল বা যেকোনো জলাশয়ে ফুল ভাসিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে নিজেদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফুল দিয়ে সাজায়। পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে স্থানীয় মন্দিরে। মন্দিরে গিয়ে বয়স্করা সরিষার তেলের সলতে জ্বালিয়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য। আর অবশ্যই ঐদিন খুব ভোরে গোসল করে নিজেদের পূত-পবিত্র করে। তারপর নতুন জামা কাপড় পড়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে আনন্দ মেতে ওঠে। আয়োজন করে গান-বাজনা ও খেলাধুলা। অবশ্য এই গান-বাজনা ও খেলাধুলার আয়োজন চলে টানা তিন দিন। এই উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় বিক্রেতারা তাদের পসরা সাজিয়ে বসে। অনেকে মন্দিরের মতো নিজেদের ঘরেও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে।

পরদিন চৈত্র সংক্রান্তি। অর্থাৎ বছরের শেষ দিন। এই দিনকে ওরা বলে মূল বিজু। ওই দিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ঘরে ঘরে 'পাবন' তৈরি। ৩০-৪০ রকম শাক-সবজি ফলমূল দিয়ে ওই পাবন তৈরি করা হয়। আর এই পাবন পরিবেশিত হয় ঘরে তৈরি মদ দিয়ে। যা দো চুয়ানি নামে পরিচিত। ঐদিনসহ উৎসবের কয়েক দিন ছেলে বুড়ো সবাই একসঙ্গে ওই মদ খেতে পারে। এদিন শুরু হয় অতিথি আপ্যায়ন। এই আপ্যায়ন চলে পর দিন বা তারপর পর্যন্ত। উৎসবের ওই তিন দিন চাকমারা কোনো প্রাণী হত্যা করে না। তবে উৎসবের শেষ দিনে অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিনের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই মাছ-মাংস থাকে। শুধু মাছ-মাংস নয় একই সঙ্গে এদিন ওরা নানান পদের খাবার তৈরি ও পরিবেশন করে। ঐদিন ওরা মূলত বয়স্কদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ার ও আশীর্বাদ গ্রহণ করে। নববর্ষের এই দিনকে ওরা বলে গব্য পথ্য বিজু। যার অর্থ গড়াগড়ি খাওয়ার দিন। ঐদিন বয়স্করা পূজা-অর্চনা করে। আর তরুণ যুবকরা গান-বাজনাসহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে। এক কথায় চাকমাদের সমাজজীবনে বিজু একটি আনন্দঘন দিন।